বাংলাদেশের মানুষের পরিচয়ের ইতিহাস: রূপান্তর, বৈচিত্র্য ও সম্মিলন

তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয়: 'তোমার পরিচয় কী? বা 'তুমি কে?', তুমি কী উত্তর দেবে? আবার, অন্যভাবেও আমরা একে অপরকে জিজ্ঞাসা করি: 'আপনার নাম কী', 'আপনার বাড়ি কোথায়?' 'বাবা-মায়ের নাম কী?' 'ঠিকানা কী?' 'আপনার দেশ কই?', 'আপনার ধর্ম কী?' 'আপনার জেলা কোথায়?' 'আপনার জাতি কী?' 'আব্বা কী করেন?' 'আম্মা কী করেন?' 'তোমার বন্ধুর নাম কী?' 'তুমি কী খেতে পছন্দ করো?' 'কী খেলা পছন্দ করো?'

উপরের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে যা যা তোমরা বলবে বা আমরা বলবো তা সবই আমাদের পরিচয় তৈরি করে। আমাদের নাম, ঠিকানা, থাকার স্থান, মা-বাবার নাম, পেশা, আত্মীয়-স্বজনের নাম-ঠিকানা-পেশা-পরিবারের অবস্থা ইত্যাদিও পরিচয় গঠন করে। অনেক সময় পাড়া-প্রতিবেশীদের নাম-পেশা-বংশ-পরিবারও আমাদের পরিচয় তৈরি করে। আমরা অন্যদের পরিচয় নিয়ে যখন কথা বলি, তখনো আমরা অন্যদের পরিচয় করিয়ে দিই। বাংলাদেশের মানুষ নানা জেলায় থাকেন, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে থাকেন। কেউ গ্রামে থাকেন। কেউ মফস্বলের ছোট শহরে থাকেন। কেউবা বড় শহরে থাকেন। আমাদের দেশের অনেকেই বিদেশে থাকেন। চাকরি করেন, পড়াশুনা করেন। আমরা অনেকেই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় বেড়াতে যাই। প্রত্যেকের পরিচয় এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় একই থাকে, আবার বদলেও যায়। আমাদের নাম একই থাকে। আমাদের ঠিকানা পাল্টে যায়। আমাদের খাওয়া-দাওয়ার অভ্যাস বদলাতে পারে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গেলে। ছোট থেকে বড় হয়ে গেলে। অন্যরা আমাদের চেহারা, কথা বলার ভাষা, পোশাক, লিঙ্গীয় পরিচয়, বয়স, পেশা অনুসারে বিভিন্নভাবে আমাদের বর্ণনা করতে পারেন। আমাদের মা-বাবার পরিচয় যেমন একই থাকে, তেমনই যে এতিম বা যুদ্ধে যার মা-বাবা দুজনেই মারা গেছেন, তাদের মা-বাবার পরিচয় থাকে। আবার যদি কোনো এতিমকে অন্য কোনো মানুষ নিয়ম অনুসারে দত্তক গ্রহণ করতে পারেন। তোমাদের কারও মা কিংবা বাবার চাকরিতে যদি বদলি হয়, তাহলে তোমাদের নতুন কোনো জায়গায় যেতে হতে পারে। নতুন স্কুলে ভর্তি হতে হবে। নতুন নতুন বন্ধু হবে। তখন তোমার স্কুলের পরিচয়, বন্ধুদের পরিচয়, ঠিকানা, তোমার কাছে বদলে যাবে। বড় হয়ে তোমাদের কেউ কৃষিকাজ করবে, চাকরি করবে, কেউ ব্যবসা করবে, কেউ বিজ্ঞানী হবে, কেউ শিল্পী হবে, কেউ খেলোয়াড় হবে। তখন তোমার পেশাগত পরিচয় বদলে যাবে। ঠিকানা বদলে যাবে।

তাহলে মানুষের পরিচয়, আমাদের পরিচয় নানা রকমের বৈশিষ্ট্য মিলে তৈরি হয়। কিছু পরিচয় যেমন জন্মগতভাবে আমরা পাই। তেমনি কিছু পরিচয় জায়গার বদল, সময়ের বদলের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে। বিভিন্ন জায়গা ও বিভিন্ন সময়ে আমাদের পরিচয়ের যে বদল ঘটে তা আমরা বুঝতে পারি, খুঁজে দেখতে পারি, আর জানতে পারি পরিচয়ের ইতিহাস নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলে। যেমন: আজকে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক। আমাদের নাগরিকত্বের পরিচয় বাংলাদেশি। আমাদের মধ্যে অনেকেই বাংলায় কথা বলেন। তারা বাঙালি। তাদের জাতিগত পরিচয় এখন বাঙালি। আবার অনেকেই আছেন যারা বাংলায় কথা বলেন না। মান্দি, সাঁওতালি, চাকমা, মারমা, ওঁরাও ভাষায় কথা বলেন। তাদের জাতিগত পরিচয় চাকমা, মারমা, ওঁরাও, সাঁওতাল, মান্দি। আমাদের মধ্যে কেউ পুরুষ, কেউ নারী আবার কেউ তৃতীয় লিঙ্গের। সেই অনুসারে তৈরি হয় লিঙ্গীয় পরিচয়। কেউ মুসলমান, কেউ হিন্দু, কেউ বৌদ্ধ, কেউ খ্রিষ্টান, কেউ অন্য কোনো

ধর্মীয় পরিচয় ধারণ করেন। কেউ ভাত-মাছ খেতে পছন্দ করেন, কেউ মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন, কেউ ভাত-মাংস-ডাল খেতে কিংবা ভর্তা-সবজি খেতে পছন্দ করেনা। জাতিগত পরিচয়, ধর্মীয় পরিচয়, এলাকার পরিচয়, পারিবারিক-ব্যক্তিগত অভ্যাস মিলে আমাদের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-আশাক, ভাষা, কথা বলার ধরন ও উচ্চারণ তৈরি হয়। আমাদের কথা বলার ধরন, উচ্চারণ, খাওয়া, পোশাক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে, এক সময় থেকে অন্য সময়ে পাল্টে যায়। গরমে আমরা যা পরি, শীতকালে আমরা অন্য পোশাকও পরি। কেউ লম্বা,কেউ একটু কম লম্বা, গায়ের রং একেকজনের একেক রকম। ঘরে আমরা যে পোশাক পরি, ঘরের বাইরে কোথাও গেলে হয়তো আমাদের পোশাক পাল্টাতে হয়। আমাদের আর্থিক অবস্থা, যে-এলাকায় থাকি সেখানকার রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, অনুষ্ঠান অনুসারে আমাদের ভাষা, পোশাক, আচরণ, খাওয়া, কখনো কখনো গায়ের রং পাল্টায়। আমাদের মধ্যে অনেকেই দুর্ঘটনায় আহত হয়ে শারীরিকভাবে কোনো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হারাতে পারেন। কেউ কেউ আমাদের মতন জীবন-যাপন না করে ভিন্নভাবে জীবন যাপন করতে পারেন। কেউ কেউ অনেক কাজ ঠিকঠাক করতে পারেন না। ভুলে যান বা জৈবিক কারণে দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা থাকে। সেগুলোর অনেক সময় আমাদের পরিচয় তৈরি করে বা পাল্টে দিতে পারে।

আমাদের মধ্যে এই যে বৈচিত্র্য, ভিন্নতা, নানা রূপ, নানা চেহারা, নানা ভাষা, নানা জাতি তা আমাদের দেশের খুব বড় সৌন্দর্য। বৈচিত্র্য ও ভিন্নতা খারাপ কিছু না। নানা ভাষা ও নানা চেহারা দুর্বলতা না। ঠাট্টা-তামাশা করার বিষয় না। ভিন্ন কোনো পরিচয়ের মানুষকে এড়িয়ে চলতে হবে, ঘৃণা করতে হবে, হিংসা করতে হবে, ঠাট্টা করতে হবে। ভাবনা ও আচরণ কিন্তু মানুষ হিসেবে আমাদের পরিচয়কে খাটো করে। আমরা মানুষ। এই পরিচয় কিন্তু আমাদের আরেকটা পরিচয়।

এবার তোমরা দলে বিভক্ত হয়ে তোমাদের দেখা বিভিন্ন মানুষের পরিচয় কীভাবে নির্ধারণ করা যায় তা নিম্নের ছক পূরণ করে উপস্থাপন করো-

মানুষের পরিচয়	পরিচয়ের উপাদান

আমরা বিভিন্ন যুগে বাংলাদেশের যে ইতিহাস আগে পড়েছি, সেখানে কিন্তু আমরা জেনেছি যে, আজকের বাংলাদেশ হাজার হাজার বছর আগে অন্য নামে পরিচিত ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগে আমাদের এই দেশের নাম বা পরিচয় কী ছিল তা আমরা এখনও জানতে পারিনি। সেই যুগে এই ভূখণ্ডে যারা বসবাস করতো তাদের জাতিগত পরিচয় কী ছিল জানা মুশকিল। তবে ঐতিহাসিক ও বিজ্ঞানীরা মনে করেন, আফ্রিকায় মানব প্রজাতির উদ্ভবের পরে তারা লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। তখন পরিবেশ-সমুদ্র-নদীনালা-জলবায়ুও কিন্তু আলাদা ছিল। পরে এই অঞ্চলে যারা বসবাস শুরু করেন তাদের বিজ্ঞানীরা নানা পরিচয়ে ডাকেন। কেউ বলেন তারা অস্ট্রিক ছিলেন, কেউ বলেন, তারা দ্রাবিড় ছিলেন, কেউ বলেন তাদের মধ্যে অনেকে মঙ্গোলয়েড ছিলেন। পরে বর্তমান ইউরোপ-এশিয়ার অন্য অংশ থেকেও মানুষ এই অঞ্চলে আসেন। মানুষের এই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গিয়ে বসবাস করার ইতিহাস তাহলে অনেক পুরোনো। লক্ষ লক্ষ বছর আগেই শুরু হয়েছে। এই যাতায়াতকে বলে অভিবাসন।

পরে হরপ্পা সভ্যতার শুরু হওয়ার আগে, হরপ্পা সভ্যতা বিকশিত হওয়ার সময় আর হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে নতুন নতুন বসতি তৈরি হওয়ার সময় কিন্তু আমাদের দেশে কোনো মানুষ ছিলেন, তা আমরা নিশ্চিত ভাবে

বলতে পারি না। তাদের ধর্ম কী ছিল তা-ও আমরা বিশদ জানি না। হরপ্পা সভ্যতা গড়ে উঠেছিল ভারত উপমহাদেশের পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে। আমাদের দেশের ভূখণ্ড বর্তমান ভারত উপমহাদেশের পূর্ব দিকে। ইতিহাসবিদগণ এই মানুষদের পরিচয় জানার চেষ্টা এখনও করছেন তা তোমরা আগেই জেনেছো।

ঔপনিবেশিক শাসনামলে মানুষের পরিচয় বোঝার জন্য নতুন একটা ধারণা তৈরি করেন ব্রিটিশসহ উপনিবেশ তৈরি করা দেশের বিজ্ঞানীরা। সেটাকে বলা হয় রেইস। বাংলায় বলা যায় নরবর্ণ। মানুষের শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিমাপ করে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গার নানা জাতির মানুষের মধ্যে গবেষণা পরিচালনা করে।মানুষের গায়ের রং, উচ্চতা, নাক ও মুখের গড়ন, মাথার খুলির মাপ, চুলের ধরন ইত্যাদি নানান বৈশিষ্ট্যের উপরে ভিত্তি করে তারা দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গার মানুষের মধ্যে তুলনা করে নানা রেইসে মানুষকে শ্রেণিবদ্ধ করেন। প্রথম থেকেই তাদের এই গবেষণা ও শ্রেণিবদ্ধকরণ ভুল বৈজ্ঞানিক ধারণার উপরে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। মানুষের ভিন্নতাকে তারা মনে করেছিলেন মানুষের শক্তিমত্তা, সাহস, বীরত্ব, বুদ্ধিমত্তা, আচার-আচরণ, স্বভাব, অভ্যাসের ভিন্নতার সঙ্গে সম্পর্কিত। নিজেরে তারা সবচাইতে শ্রেষ্ঠ ও উন্নত রেইস বা নরবর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করলেন। তারা দাবি করলেন যে, তারা পৃথিবীতে সকলের আগে সভ্যতা তৈরি করেছে কারণ, তারা সবচাইতে বুদ্ধিমান, সবচাইতে শ্রেষ্ঠ, সবচাইতে বীর। অন্যরা তাদের চাইতে নিকৃষ্ট, কম বুদ্ধিমান, দুর্বল, আর অজ্ঞ।

নিজেদের তারা নাম দিলেন আর্য। অন্যদের বিভিন্ন নামে ডাকলেন। উনবিংশ শতক ও তার পরে এই রেইসের ধারণা পৃথিবীতে নানা জায়গায় ইউরোপীয় ও আমেরিকার শাসন ও আধিপত্য বজায় রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আর্যরা যেহেতু শ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে ভালো, অনার্য বা অন্যান্য রেইসকে তাদের অধীনে ও শাসনে থাকলে অনার্যরাও উন্নতি করতে পারবে তাড়াতাড়ি— এই ছিল তাদের যুক্তি। অনেকে তখন তাদের এই ধারণাকে সঠিক বলে মনে করেছিলেন।

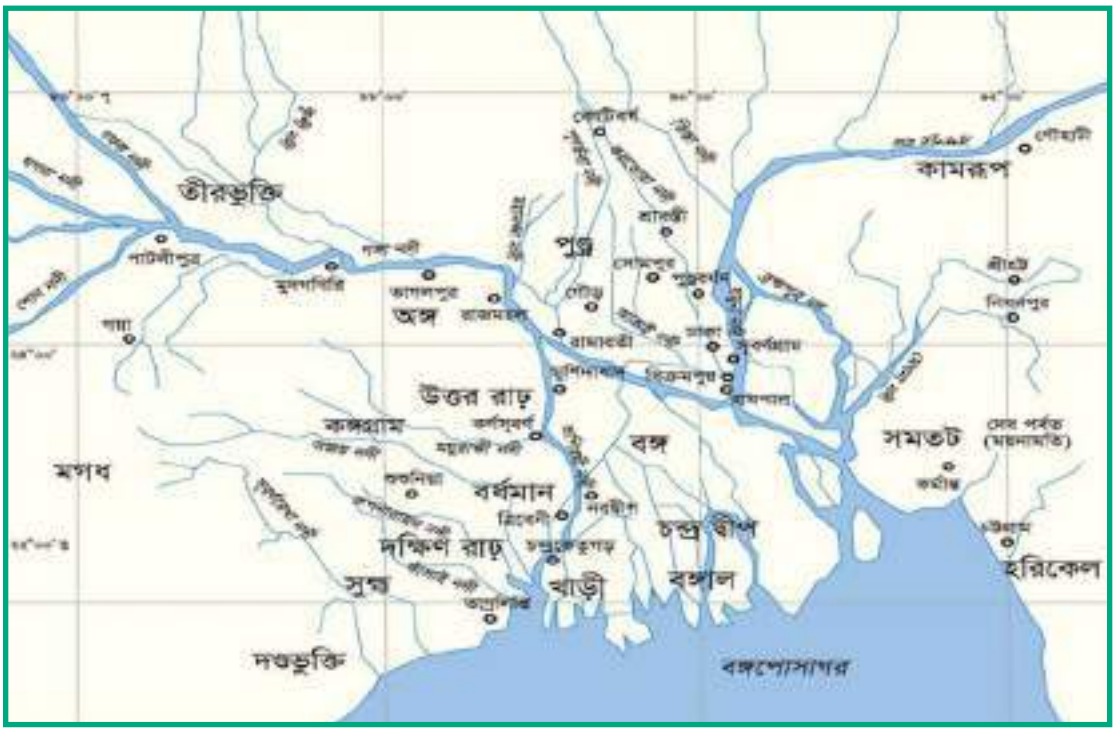

এদেরই যারা ভারত উপমহাদেশে উপনিবেশ তৈরি করেছিল, তারাও ভারত উপমহাদেশের মানুষকে বিভিন্ন রেইসে বিভক্ত করেন। মানুষকে নানা শ্রেণিতে ভাগ করেন। এক দলকে তারা বললেন আর্য। তারা বললেন, এই আর্যরা হরপ্পা সভ্যতার একটা সময়ে ভারত উপমহাদেশের বাইরে থেকে অভিবাসন করেন। তাদের শ্রেষ্ঠত্বের ও বীরত্বের মাধ্যমে প্রথমে হরপ্পা সভ্যতার এলাকা এবং পরে পুরো ভারত উপমহাদেশে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। এখানকার মানুষদের মধ্যে যারা ওই আর্যদের পরবর্তী প্রজন্ম, তাদের এই ইতিহাসবিদরা নাম দিলেন 'ইন্দো-আর্য' আর তারা ইন্দো-ইউরোপীয় নানান ভাষায় কথা বলতেন। অন্যদিকে, হরপ্পা সভ্যতার মানুষজনকে তারা বললেন অনার্য ও দ্রাবিড়। তাদের ভাষাও অনুন্নত, নিকৃষ্ট আর ভাব প্রকাশের অনুপযুক্ত।

ভারত উপমহাদেশের বাইরের ভূখণ্ড থেকে বিভিন্ন সময়েই দলে দলে বিভিন্ন মানুষ এসেছে। এসে স্থায়ীভাবে

বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা থেকে দূরে থাকি:

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বর্ণবাদ সম্পর্কে ধারণা পেলাম। এবার আমরা বন্ধুদের সঙ্গে নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করি। আলোচনা শেষে চলো প্রশ্নের উত্তরগুলো নিয়ে পোস্টার পেপারে তা উপস্থাপন করি-

১. বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা কীভাবে চিন্হিত করা যায়?

২. বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা মানুষের মধ্যে কীভাবে বিভেদ তৈরি করে?

৩. বর্ণবাদী ও সাম্প্রদায়িক মানসিকতা পরিহারের উপায় কী?

বসবাস করা শুরু করেছে। হরপ্পা সভ্যতার আগেও তারা এসেছেন, হরপ্পা সভ্যতার সময়েও অনেকে এসেছেন, আবার একটা বড় সংখ্যা কয়েক বারে তারা এসেছেন। বসতি তৈরি করেছেন। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে বৈবাহিক ও পারিবারিক সম্পর্ক তৈরি করেছেন। কিন্তু বাইরে থেকে আসা মানুষ অন্য ভাষায় কথা বললেও, অন্য ধরনের জীবনযাপন করলেও, তারা যে হরপ্পা সভ্যতা গড়ে তোলা মানুষজন বা তার পরে এই উপমহাদেশে বসবাস করা মানুষদের চাইতে রূপে, গুণে, বুদ্ধিতে, শক্তিতে উন্নত ছিলেন তা কিন্তু নয়। এমনকি তখন ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানেও একই জাতির মানুষ, একই ভাষায় কথা বলা মানুষ, একই আচার-আচরণ, খাদ্যাভ্যাসের মানুষ, একই রীতি-নীতি পালনকারী মানুষ ছিলেন তা কিন্তু নয়।

বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন জনপদে বিভিন্ন রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ভাষা, খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত মানুষেরা ছিলেন। ভিন্নতা মানেই কিন্তু কেউ ভালো, কেউ মন্দ না। মানুষে মানুষে চেহারা, গায়ের রং, উচ্চতা, শরীরের গড়নের ফারাক থাকা মানেই কেউ শ্রেষ্ঠ, কেউ নিকৃষ্ট, কেউ বেশি বুদ্ধিমান, কেউ কম বুদ্ধিমান, কেউ ভালো গুণের কিংবা কেউ খারাপ গুণের নয়। ভালো-মন্দ, বেশি বুদ্ধিমত্তা-কম বুদ্ধিমত্তা, ভালো কাজ করা, খারাপ কাজ করা, ভালো আচরণ করা-খারাপ আচরণ করার সঙ্গে শরীরের দেহ-বৈশিষ্ট্যের, রক্তের বৈশিষ্ট্যের বা বংশপরিচয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। মানুষ জন্মের পরে বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক কারণে বিভিন্ন ধরনের পরিচয়ে পরিচিত হয় বা পরিচয় প্রদান করে। রেইসের ধারণা, মানুষে মানুষের মধ্যে এমন বিভক্তি, ঘৃণা ও হানাহানি তৈরি করলো যে পরে এই ধারণাকে বর্ণবাদ হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। শ্রেষ্ঠত্ব ও দুর্বলতার এই বর্ণবাদী ধারণাকে পরের ইতিহাসবিদগণ ভুল, পক্ষপাতদুষ্ট এবং মানুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টিকারী হিসেবে চিহ্নিত

করলেন। তারা বললেন, সকল মানুষের মধ্যে বিভিন্ন ভিন্নতা থাকলেও নানান পরিচয়ের মানুষ থাকলেও কোনো পরিচয়ও অনাদি ও অনন্তকাল ধরে একই থাকে না। আর পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে ফারাক করে অসমতা ও বৈষম্য তৈরি করা মানুষে মানুষের বিভেদ, সংঘাত ও বৈষম্য বাড়ায়।

ইতিহাসের দিকে তাকালেও আমরা নানা সময়ে এই অঞ্চলের মানুষের নানা ধরনের পরিচয়ের সন্ধান পাবো। আজ আমাদের যেমন একই সঙ্গে অনেকগুলো পরিচয় হতে পারে, ঠিক তেমনি আজকের পরিচয় অতীতের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রকমেরও হতে পারে। তোমাদের বোঝানোর জন্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ঐতিহাসিক যুগের সূচনার দিকে ভারত উপমহাদেশের মানুষকে একদল আর্য ও অনার্য হিসেবে চিহ্নিত করলেও সেই পরিচয় কিছুসংখ্যক ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাভাষী মানুষ (তখন যারা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতো) তৈরি করেছিলেন। তারা এখনকার বাংলাদেশের তখনকার মানুষকে দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলা অনার্য বা দাস বা দস্যু হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। তারা নিজেদের সবচেয়ে ভদ্র, সবচেয়ে উন্নত, সবচেয়ে জ্ঞানী হিসেবে পরিচয় করিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারত, বর্তমান বাংলাদেশ, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলসহ বিরাট এক অঞ্চলে নানা ভাষায় কথা বলা বিভিন্ন চেহারার, আচারের ও রীতিনীতি মেনে চলা মানুষদের তারা 'নিকৃষ্ট' বললেন।

কিন্তু তখন অনেকগুলো অঞ্চল ছিল আলাদা আলাদা। সেগুলোর নাম ছিল মহাজনপদ। তাদের নামও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। যেমন– মগধ, গান্ধার, মিথিলা, কুরু ইত্যাদি। সেখানকার মানুষেরা সেই মহাজনপদের নামে, অথবা নিজের গোত্রের নামে, অথবা কোন নগরে বসবাস করছেন সেই নামে পরিচিত হতেন। বিভিন্ন ভাষার পরিচয়েও পরিচিত হতেন। আজকে যেখানে মহাস্থান সেই অঞ্চল তখন পুণ্ড্র নামে পরিচিত ছিল। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের নাম ছিল গঙ্গাঋদ্ধি বা গঙ্গারিডি। উত্তর-পূর্বাঞ্চল কিরাত দেশ নামে নামেও পরিচিত ছিল। বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চলের একটা অংশের নাম ছিল বঙ্গ। মানুষের পরিচয়ও ওইসব অঞ্চলের নামে পরিচিত হতো। নিজেদের রীতিনীতির নামে হতো। বাচনভঙ্গির নামে, অথবা ধর্মমত অনুসারে পরিচয়ও প্রচলিত ছিল।

বর্তমান বাংলাদেশ ও বর্তমান ভারতের পশ্চিম বাংলা ও বিহারের একাংশ মিলে যে অঞ্চলটি, সেই অঞ্চলটির মধ্যে পরিচয়েরর ভিন্নতা মোটামুটি একটা স্পষ্ট রূপ ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় আরও পরের যুগ থেকে। ৭ম-৮ম সাধারণাব্দ থেকে এই অঞ্চলে কতকগুলো আলাদা আলাদা রাষ্ট্র (বা জনপদের) কথা ইতিহাসবিদগণ জানতে পারেন।

সাধারণ. ৭ম-৮ম শতকের দিকে আজকের বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের উত্তর ও পশ্চিম দিকের ভূভাগে কতকগুলো অঞ্চল তৈরি হয়েছিল তাদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, রীতিনীতি, রাষ্ট্রব্যবস্থা নিয়ে। এগুলোর মধ্যে ছিল: বরেন্দ্র, বঙ্গ, সমতট, হরিকেল, রাঢ়, কলিঙ্গ, বিদেহ, অঙ্গ, কামরূপ ইত্যাদি। একই সময়ে বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরাংশ (যা বরেন্দ্র ও পুণ্ড্রবর্ধন নামেও পরিচিত ছিল) ও ভারতের পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশ গৌড় নামেও পরিচিত ছিল। এখানকার শাসকগণকে গৌড়ের শাসক হিসেবে বাইরের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষেরা ডাকতেন। এখানকার মানুষদের গৌড়ীয়, বরেন্দ্রী, পুণ্ড্রদেশীয় নামে ডাকা হতো। তখনও বিভিন্ন পেশা ও শ্রেনির মানুষের পরিচয়ে উল্লেখ বিভিন্ন সাক্ষ্যে পাওয়া যায়। প্রশাসকদের পরিচয়ও ছিল আলাদা আলাদা। কখনও কাউকে সম্মান করে কোনো বিশেষ পরিচয়ে সম্বোধন করা হতো। কখনও বা কাউকে খাটো করতে অন্য কোনো পরিচয় দিতো উঁচু শ্রেণির বা জাতির মানুষরা। শূদ্র বা অস্পৃশ্য বা দস্যু বা চণ্ডাল নামে পরিচয় দিয়ে তাদের সঙ্গে মেলামেশা এড়িয়ে চলার কথাও কোনো কোনো লিখিত উৎসে বলা হয়েছে। আবার অন্যভাবেও একেক অঞ্চলের মানুষের পরিচয় দিতেন অন্য অঞ্চলের মানুষ। যেমন: পূর্ব-দেশীয়, পশ্চিম-দেশীয় ইত্যাদি। অন্য স্থানের বা বাইরের মানুষদের খাটো করতে যবন, ম্লেচ্ছ, ইত্যাদি নামও ব্যবহৃত হতো। শাসক কিংবা উঁচু জাতির মানুষ নিজেদের

শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর জন্য আর অন্য এলাকা, জাতি বা সম্প্রদায়ের মানুষকে খাটো করার জন্যও নানা পরিচয় আরোপ করতো। পাশাপাশি, সকল সম্প্রদায়ের, অঞ্চলের, মতের, পথের মানুষকে একে অপরকে ভালোবাসার জন্য, পরস্পরের মতামতকে সম্মান করার জন্য, বিরোধ না-করার জন্যও আহ্বান জানানো হয়েছে। সম্রাট অশোক থেকে শুরু করে সম্রাট আকবর অব্দি বহু শাসক ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ের মানুষকে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্যের সঙ্গে বসবাস করার জন্য বলেছেন। সংস্কৃত, প্রাকৃত, আরবি, ফারসি, তামিল এবং মধ্যযুগের বাংলা কবিতা, কাহিনি কিংবা অন্যান্য সাহিত্যের বিভিন্ন এলাকা, পরিচয়, জাতি, অঞ্চলের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় নিয়েও বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও মমতার কথা বলা হয়েছে।

মোগল আমলে বাংলাদেশসহ ভারতের কিছু অংশ মিলে যে-প্রশাসনিক একক তৈরি করা হয়েছিল তার নাম ছিল সুবা বাংলা। সুবা ছিল একেকটি প্রশাসনিক একক। সেখানে আজকের বাংলাদেশের পরিচয় ছিল বাঙ্গালাহ্ বা বেঙ্গালা। মধ্যযুগে যখন ইউরোপ থেকে বণিকেরা, পর্যটকরা বা দূতরা এই অঞ্চলে এসেছেন, তখন তারা এই অঞ্চলকে বেঙ্গালা বা বাঙ্গালাহ্ নামেও আখ্যায়িত করেছেন। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের পরিচয়ও তাদের অঞ্চলের সেই সময়ের নাম, সম্প্রদায়ের নাম, ধর্মমত অনুসারে নাম কিংবা জাতির বা ভাষার নাম ও বাচনভঙ্গির নামেও পরিচয় করানো হতো। প্রত্যেক মানুষের আলাদা আলাদা নাম সব সময়ই ছিল। সেই নামের সঙ্গে তিনি যে অঞ্চলের সেই অঞ্চলের নামও উল্লেখ করা হতো।

পরে আগেকার অঞ্চলের নাম বঙ্গ ছিল বা পরে যে অঞ্চলের নাম বেঙ্গালা বা বাঙ্গালা নামে পরিচিত হলো সেখান থেকেই নাম হলো বাংলা। বাংলার পশ্চিমাংশ, উত্তরাংশ বা পূর্বাংশ ধরে কিংবা নদী-ভূমিরূপ অনুসারেও মানুষের পরিচয় নির্ধারিত হতো। কাউকে বলা হতো 'ভাটির দেশের' মানুষ। কাউকে বলা হতো 'উজানের মানুষ'। নদীর এক পারের মানুষ অন্য পারের মানুষকে একভাবে চিনতো, জানতো আর মেলামেশা করতো। সেই বঙ্গ বা বাঙ্গালাহ্ থেকে নাম হলো বাঙালি। আবার যারা অন্য ভাষায় কথা বলতেন, তাদের পরিচয়ও ভিন্নভাবে দেওয়া হতো।

এই ভিন্ন ভিন্ন অনেক পরিচয় আমাদের দেশের মানুষের অতীতে ছিল। এখনও আমাদের নানা পরিচয় আছে। একই মানুষের একই সঙ্গে অনেকগুলো পরিচয় থাকতে পারে। নাম, ঠিকানা, ধর্ম, লিঙ্গ, আচার অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় হতে পারে। আবার জাতি ও নাগরিকত্ব অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ও হতে পারে। সকল পরিচয়ের সম্মিলনে আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরিচয় তৈরি হয়েছে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। আমাদের প্রত্যেকের পরিচয় আমাদের জন্য গুরুত্ব বহন করে। আমাদের অস্তিত্বের জন্য দরকারি হতে পারে। কিন্তু পরিচয়ের ভিন্নতা আর ফারাক আগেও ছিল। এখনও আছে। পরিচয়ের কারণে কাউকে ছোট করা, কাউকে খারাপ মনে করা, কাউকে ঘৃণা করা, কাউকে জবরদস্তি করা, কারও উপরে জুলুম করা ঠিক নায়। আগেও এই জুলুমকে অপরাধ ভাবা হতো। আমাদের বাংলাদেশের সংবিধান ও আইনেও এই বৈষম্য ও জুলুমকে অপরাধ বলে বিবেচনা করা হয়। সকল ভিন্ন ভিন্ন পরিচয় নিয়েই আমরা সবাই মানুষ। সকলে একই রকম হলে ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের সৌন্দর্য আর সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। মানুষের পরিচয়ের বৈচিত্র্য, ভিন্নতা আর পার্থক্য মিলেই আমাদের আজকের বাংলাদেশ।